উপসংহার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন:

আধুনিক যুগে উপন্যাসের শিল্প সংরূপে গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তি মানুষের অধিকার, তার স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি মুখ্য স্থান লাভ করে। তাই বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে যে ব্যক্তি চরিত্র বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণের পথে একাকী গমন করেছিল— সেই একক ব্যক্তিমানুষের উত্তরসূরী হিসাবে পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তি মানুষের কাহিনি উপন্যাসের শিল্প সংরূপে প্রকাশ করেছেন। আবার সময়ের হাত ধরে সেই ব্যক্তি মানুষের বিবর্তিত রূপ বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হওয়া ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসে ধরে রেখেছেন। কালপ্রবাহের চাকায় সওয়ারি হয়ে এরপর আমরা পৌঁছে যাই স্বাধীন ভারতবর্ষের পঞ্চাশের দশকে। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের জীবনদৃষ্টি, শিল্পরীতি ও বিষয় নির্বাচনের সাক্ষী থেকেছি আমরা। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা, প্রকৃতির রহস্য, জীবনের রহস্যের কথা পাঠ করেছি।

আসলে শিল্প-সৃষ্টির মৌলিক উপাদনই হলো জীবন। তবে হয়তো উপন্যাসের সঙ্গেই জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। জীবনের কথা, জীবনের দাবি, জীবনের অধিকার, জীবনের রহস্যের স্বাদ পেয়ে, বিস্মিত হয়ে, অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সিক্ত করে লেখক উপন্যাসের কাহিনির মাধ্যমে তা পরিবেশন করেন। সেই কাহিনিতে ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র লেখকের জীবনদৃষ্টি প্রকাশের অন্যতম সহায়ক হয়ে ওঠে। আবার কাহিনি ধারণ করে থাকে সময়, সমাজ ও ঐতিহ্যকে। তাই উপন্যাসের নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণে উঠে আসে লেখকের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতার সঞ্চরণে সময়-সমাজ-ঐতিহ্য, বৈচিত্র্যময় জীবনের বৈচিত্র্যময় বিষয় ও অনন্ত রহস্যের খনি প্রকৃতি সম্পর্কিত উপলব্ধি।

কিন্তু লেখকের আসল কৃতিত্ব লুকিয়ে থাকে তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিমায়। 'লুকিয়ে' থাকে বল্‌লাম এই কারণে যে, প্রত্যেক শিল্পীই হয়তো তাঁর নির্মাণের বিভিন্ন অংশ, জোড়, কাঠামো, মিশ্রণ, সর্বোপরি পদ্ধতি গুপ্ত রেখে শিল্পবস্তু পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেন। এর ফলেই আস্বাদ্য বস্তু হিসাবে শিল্পবস্তু রূপ লাভ করে। তাই আমরা বলতেই পারি শিল্পরীতিই একমাত্র স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে স্বতন্ত্র, অভিনব। এমনকি শিল্পীরীতির হাত ধরেই জীবনদৃষ্টি, বিষয় নির্বাচন স্বতন্ত্রতা লাভ করে।

এজন্যই সাহিত্যের ইতিহাস আসলে প্রকাশভঙ্গিমার ইতিহাস। ভাষা-নির্ভর শিল্প হিসাবে উপন্যাসই মনে হয় শিল্পরীতির ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীন। উপন্যাসের শিল্প সংরূপের মধ্যেই এই লেখক-স্বেচ্ছাচারী স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিহিত। ফলে কখনও কখনও সমালোচক, গবেষকদের ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় উপন্যাসের রচনাকৌশল আলোচনার মানদণ্ড নির্ধারণে। আর শিল্পরীতির আলোচনা ছাড়া কোনও সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন বা সাহিত্যিকের কৃতিত্বের বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং তা শুধু লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার আলোচনার শব্দপুঞ্জে রূপান্তরিত হয়। অনেক সময় রচনাকারের নিজের রচনা সম্পর্কে প্রকাশিত বক্তব্য তাঁর রচনা সম্পর্কে আলোচনা, বিশ্লেষণ করতে অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। কিন্তু সর্বদা রচনাকারের নিজের রচনা সম্পর্কে ভাবনা ঠিক বা শেষ সিদ্ধান্ত হবে, এরকম কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে পা রাখেন একঝাঁক তরুণ। যাদের জন্ম ও বালক-কৈশোর পর্ব কেটেছে পরাধীন ভারতবর্ষে। এই সময়পর্বে তাঁরা সাক্ষী থেকেছেন নানান ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি)। এই একঝাঁক তরুণ লেখকদের মধ্যে একজন হলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। স্বাধীন ভাতবর্ষের কলকাতায় ছিন্নমূল হয়ে সপরিবারে যিনি চলে আসতে বাধ্য হন। যাঁর মধ্যে নিজের জন্মভূমির প্রতি, বালক-কৈশোর পর্বের প্রতি এক প্রবল টান আমৃত্যু আমরা দেখতে পেয়েছি শ্যামলের উপন্যাসের মধ্য থেকে। একদিকে ছিন্নমূল হবার যন্ত্রণা অন্যদিকে স্বাধীন এক রাষ্ট্র থেকে প্রত্যাশা— এই দুই দিক থেকে পীড়িত হয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকের অনেক সাহিত্যিক। এক্ষেত্রে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম একজন। স্বভাবতই সেই সব সাহিত্যিকদের রচনায় বিশেষ করে নায়ক বা প্রধান চরিত্রের মধ্যে পীড়ন ভেতরে ও বাইরে, দুই দিক থেকে লক্ষ্য করা যায়। পীড়নের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নায়ক বা প্রধান চরিত্রের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধ, একাকীত্ববোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে যে চরিত্র (জগৎ সিংহ) একাকী গমন করেছিল, পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এসে সেই চরিত্রই যেন সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে প্রভাবিত হয়ে জীবনের যাত্রাপথে একাকী গমন করছিল। অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দুখিয়ার কুঠি' (১৯৫৯), 'নির্বাস' (১৯৫৯), সমরেশ বসুর 'বিবর' (১৯৬৫), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' (১৯৬৬), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' (১৯৬৭), বিমল করের 'পূর্ণ-অপূর্ণ' (১৯৬৭), সন্তোষকুমার ঘোষের 'মুখের রেখা' (১৯৫৯)

ইত্যাদি উপন্যাসে নায়কের নিঃসঙ্গতাবোধ, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতার কাহিনি পাঠ করি। এই ধরনের উপন্যাস হিসাবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৃহন্নলা' (১৯৬১, প্রমথ চরিত্র), 'অনিলের পুতুল' (১৯৬২, অনিল চরিত্র), 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭, কুবের চরিত্র) উপন্যাসেও নায়ক চরিত্রের মধ্যে সময়-সমাজ দ্বারা বিদ্ধ পীড়িত-দীর্ণ মুখ দেখতে পাই। সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় কম্পিত মন একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়। তবে এক্ষেত্রে সার্থক দৃষ্টান্ত হবে 'নির্বান্ধব' (১৯৭২, নিবারণ চরিত্র), 'হাওয়াগাড়ি' (১ম খণ্ড-১৯৭৯, ২য় খণ্ড-১৯৮০, দিলীপ চরিত্র), 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬, অনাথ চরিত্র) উপন্যাসগুলো। তবে উল্লিখিত লেখকগণ থেকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে জীবনদৃষ্টিতে। অনিশ্চয়তা, বিষণ্ণতাবোধকে রক্তে ধারণ করেও শেষপর্যন্ত জীবনের দিকে মুখ করে জীবনের পথে আবর্তিত হওয়া শ্যামলের নায়কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরাজয়, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দৌড় থামানোর (জীবনের পথে) কোনও উপায় নেই শ্যামলের নায়কদের। জীবন-প্রকৃতির রহস্য যেমন অসীম তেমনি তার উপভোগ্যতারও কোনও শেষ নেই। তাই শ্যামলের নায়কেরা জীবন-প্রকৃতির এই রসাস্বাদনে অক্লান্ত। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পর্বে। পঞ্চাশের দশকে সাহিত্য ভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, নায়কের স্বীকারোক্তিমূলক মনোভাব। নায়ক নিজের পাপবোধে পীড়িত হয়েছে। এই পাপবোধই কখনও কখনও নায়কের বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে উঠেছে। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে জানিয়েছেন, এই ধারার সূচনা ঘটেছে দস্তয়েভস্কীর 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট' (১৮৬৬) উপন্যাসের প্রভাব থেকে। এই ধরনের উপন্যাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারি, সমরেশ বসুর 'মানুষ' (১৯৭০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার সুর' (১৯৬৬), 'নির্জন শিখর' (১৯৬৮), 'তৃতীয় নয়ন' (১৯৬৯), 'কাচের দরজা' (১৯৭০) ইত্যাদি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যেও এই ধারার প্রভাব পড়েছে। 'বৃহন্নলা' (১৯৬১) উপন্যাসের প্রমথ চরিত্র, 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭) উপন্যাসের কুবের চরিত্র, 'স্বর্গে তিন পাপী' (১৯৭৫) উপন্যাসের তিন বন্ধু (অক্ষয়, চন্দ্রকান্ত, পরশুরাম), 'আবিষ্কার' (১৯৭৭) উপন্যাসের নিতাই ডাক্তার প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে স্বীকারোক্তিমূলক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে শ্যামলের স্বাতন্ত্র্য তখন অনুভব করা যায় যখন তাঁর চরিত্ররা স্বীকারোক্তির পর্যায়ে না থেমে এগিয়ে যায় জীবনের পথে। কারণ জীবনের অপার বিস্ময়ে তারা ক্রমশ নিমজ্জমান থাকে আমৃত্যু। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

উপন্যাস সর্বদাই জীবনরহস্যের সন্ধানে নিয়োজিত। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে তাঁদের মানস প্রবণতা অনুযায়ী জীবনরহস্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। শ্যামলের ভাবনা হলো, ''মানুষের বিশ্বাস, মানুষের রূপ, মানুষের বৈচিত্র্য, মানুষের পতন, মানুষের উত্থান, পড়তে পড়তে বড় হয়ে ওঠা, বড় হয়ে ওঠার ভেতর পতনের বীজ।'' ('জীবনরহস্য'/পৃ. ২২৮) এর মধ্য দিয়েই লেখক জীবনসত্যের অন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন। তাই জীবনকে মুহূর্তে বিভাজিত করে শ্যামল যেমন ব্যক্তিগত জীবনে অনুভব করেছেন, তাঁর সৃষ্ট নায়কেরাও তেমন করেছেন। তাই লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর প্রধান চরিত্র লেখকেরই অনুরূপ সত্তার ভূমিকা পালন করেছে। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে লেখক-অনুরূপ সত্তার এত ব্যাপকহারে ব্যবহার আর কোনও সাহিত্যিক হয়তো করেননি। এই বিষয়টি আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। জীবনের প্রতি গভীর কৌতূহল (মানুষ ও মনুষ্যতর জীবন) ছিল বলেই শোকে, বিষাদে, ক্রোধে, বিক্ষোভে, আনন্দে শ্যামল একেবারে আত্মহারা হয়ে যাননি। বরং বারবার শ্রেণিচ্যুত হতে চেয়েছেন জীবন ও রচনার প্রথাগত ধারণা থেকে। তাই শ্যামলের চরিত্ররা তথাকথিত সুরক্ষিত অনুকুল জীবনকে অস্বীকার করে বিপরীত জীবনকে বেছে নিয়েছে। জীবনসত্যের অন্বেষণে অক্লান্ত থেকেছে। তাই শ্যামলের উপন্যাস পাঠে মনে হয় তিনি যেন জীবনকে উৎসবের মত উদ্‌যাপিত করেছেন। 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭) উপন্যাসে কুবের, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬) উপন্যাসে অনাথবন্ধু বসু, 'হাওয়াগাড়ি' (১ম খণ্ড-১৯৭৯, ২য় খণ্ড-১৯৮০) উপন্যাসে দিলীপ বসু, 'মহাজীবন' (১৯৯৫) উপন্যাসে রজত পালিত, 'সরমা ও নীলকান্ত' (১৯৭২) উপন্যাসে সরমা ও নীলকান্তের অন্বেষণে ব্যক্তিগত জীবন যেমন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে— অন্যদিকে 'নতুন ভুবন' (১৯৭৩), 'অলীকবাবু' (১৯৮১), 'সওদাগর' (১৯৮১), 'শাহজাদা দারাশুকো' (১ম খণ্ড-১৯৯১, ২য় খণ্ড-১৯৯১), 'আলো নেই' (১ম খণ্ড-১৯৯৯, ২য় খণ্ড ২০০২) উপন্যাসে তেমন সমষ্টিগত জীবনসত্যের অন্বেষণে লেখক নিয়োজিত। এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যেসব সাহিত্যিকদের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশ বাল্যকৈশোর পর্ব অবিভক্ত বঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অনেকেই কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছেন। যে ঐতিহাসিক কালখণ্ডে এনারা সময় কাটিয়েছেন— পরবর্তীকালের লেখায় অতিক্রান্ত করা শৈশব-কৈশোর পর্ব প্রভাব ফেলেছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'উজান', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্ধেক জীবন' (২০০২) ইত্যাদি উপন্যাসে

শৈশব-কৈশোরের প্রভাব পড়েছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''যার পকেটে শৈশব নেই সে যেন কোনদিন প্রতিভার নদীতে না নামে। নামলেই ডুবে যাবে। নয়তো ভেসে যাবে। যার আছে— সেই শুধু সাঁতরাতে পারবে। জীবনেও তাই হয়। ভালো ছোটবেলা আসলে বড় বেলার অ্যাডভান্স টিকিট। আগে লাইন দিয়ে কেটে রাখতে হয়। এ টিকিট হাতে থাকলে বড়বেলাটাও সুন্দর।'' (জীবনরহস্য/পৃ. ১৫৮) খুলনায় কাটানো শৈশব-কৈশোর পর্ব শ্যামলের খুব প্রিয় স্মৃতি ছিল। তাই এই পর্বের স্মৃতিআকুলতা লেখকের সারাজীবনের লেখায় প্রভাব ফেলেছে। বারবার ঘুরেফিরে এসেছে বিভিন্ন লেখায় খুলনার স্মৃতি। যেমন, 'ফিরোজা' (১৯৯৪), 'আলো নেই' (১ম খণ্ড-১৯৯৯, ২য় খণ্ড-২০০২) উপন্যাস। তবে শুধু শৈশব স্মৃতি নয়, আরও বিভিন্ন ঘটনা-প্রসঙ্গ বিভিন্ন উপন্যাসে ঘুরেফিরে এসেছে। যেমন, কলকাতায় কৈশোর পর্ব—'কুবেরের বিষয় আশয়', 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে। বেলুড়ের ওপেন হার্থ ফারনেসে কাজ করার অভিজ্ঞতা— 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে। গ্রামজীবনের (চম্পাহাটি পর্ব) অভিজ্ঞতা— 'কুবেরের বিষয় আশয়', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বর জংশন' উপন্যাসে। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে মেয়ের বয়সী এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ার অভিজ্ঞতা— 'শাজহাজাদা দারাশুকো', 'তারসানাই', 'কামিনীকাঞ্চন', 'অদৃশ্য ভূমিকম্প' ইত্যাদি উপন্যাসে। ঘটনা-প্রসঙ্গ যেমন ঘুরেফিরে এসেছে তেমনি বিভিন্ন চরিত্রকেও স্বাভাবিকভাবে ঘুরেফিরে আসতে দেখি। তাই লেখকের স্বীকারোক্তি, ''ঘুরে ফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশুনো একজন লোক। তার নাম শ্যামল গাঙ্গুলি।'' (জীবনরহস্য/পৃ. ১৮০) আত্মজৈবনিক উপাদানের এত ব্যাপক ব্যবহার এত উপন্যাসে করেছেন যে, তাতে শ্যামলের জুড়ি মেলা ভার। তাই তাঁর উপন্যাস পাঠে মনে হয় তিনি যেন সারাজীবন ধরে একটি উপন্যাসই লিখেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

রাজনৈতিক অস্থিরতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা। রাজনৈতিক সংঘাত, মতবাদ-বিশ্বাসের লড়াই দেখেছেন ছোটবেলা থেকেই। নিজের সেজদা তনুদা অর্থাৎ পূর্ণেন্দুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। লেখক নিজেও কলেজ জীবনে কমিউনিস্ট ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস রাখতে পারেননি। লেখক স্পষ্ট জানান, ''আমার কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। কোনদিন মনে হয়নি— অমুকে ক্ষমতাচ্যুত হলে এবং সে জায়গায় অমুক এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সর্বদাই জানি — রাষ্ট্র ও প্রশাসন মানে একটি অন্ধ কবন্ধ দানব। সেজন্যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী

নয়। এটা একটা ব্যবস্থা বা প্রথা।" (জীবন রহস্য/পৃ. ১৮২) তাই শ্যামলের কোনও উপন্যাসে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় না। স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্তরের দশক আর পাঁচটা দশকের মত ছিল না। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে নকশালবাড়ি জেলায় একদল কৃষক সংগঠিত হয়ে জমিদার, জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এরপরেই মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী মানুষজন এক সহিংস উগ্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। অতিদ্রুত সারা বাংলায় তা ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই উগ্র রূপ—এর আগে ভারতীয় উপমহাদেশে কখনও দেখা যায়নি। অচিরেই নকশালবাড়ি আন্দোলন হত্যার রাজনীতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। অবশ্য নকশাল বিপ্লবীরা নিজেদেরকে 'স্বপ্নের কারবারি' হিসাবে ঘোষণা করেছিল। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের অনেক সাহিত্যিক নকশাল আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই নকশাল আন্দোলন উঠে আসতে থাকল তাঁদের লেখায়। যেমন, স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' (১৯৭২), মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'শ্যাওলা' (১৯৭৭), শৈবাল মিত্রের 'অজ্ঞাতবাস' (১৯৮০), জয়া মিত্রের 'হন্যমান' (১৯৭৬), জয়ন্ত জোয়ারদারের 'এভাবেই এগোয়' (১৯৭৮), গুণময় মান্নার 'শালবণী' (১৯৭৮), তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' (১৯৭০), সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭) ইত্যাদি উপন্যাস। নকশাল আন্দোলনের বিষয়-প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাওয়াগাড়ি' (দু'টি খণ্ডেই), 'একদা ঘাতক', 'সতী অসতী' উপন্যাসে পাই। কিন্তু শুধুমাত্র নকশাল আন্দোলনকে মুখ্য বিষয় করে শ্যামল কোনও উপন্যাস লেখেননি। আসলে লেখক নকশালবাড়ি আন্দোলনকে খুন করার রাজনীতি হিসাবেই দেখেছেন। তাই এই আন্দোলন সম্পর্কে কোনও নীতিগত সমর্থন লেখকের ছিল না। 'হাওয়াগাড়ি' (প্রথম খণ্ড) উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, ''মানুষের ভালোর জন্যে মানুষ খতমেও রবি পিছপাও নয়। কিন্তু রবির বাবা হিসাবে তার বিশ্বাস: মানুষকে নিশ্চিহ্ন করলেও তার স্মৃতি মোছা যায় না।" আমার গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের (১৮৯৩) হাত ধরে। এই ধারাটি পরবর্তীকালে ক্ষীণ হয়ে গেলেও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' (তিনখণ্ড-১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬), 'পদসঞ্চার' (১৯৬৪), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' (১৯৫৮),

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' (১৯৬৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' (দুটি খণ্ড, ১৯৮১, ১৯৮২), বাণী বসুর 'মৈত্রেয় জাতক' (১৯৯৬) বিংশ শতাব্দীর কিছু উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে এই শতকে ইতিহাস নিয়ে বিশেষ করে মোঘল রাজবংশ নিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসটি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন দুটি খণ্ডে 'শাহজাদা দারাশুকো'। বঙ্কিম পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মোঘল রাজবংশ নিয়ে এমন সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস আর কেউ লেখেননি। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকাংশে লেখক বলেন, ''শাহজাদা দারাশুকো হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মচিন্তায় মিলনবিন্দুটি খুঁজতে গিয়ে সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যান। তাই তিনি হিন্দুস্থানের ইতিহাসে একটি কালো গোলাপ। ব্যথা, সৌন্দর্য, কালের ইতিহাসের সঙ্গে এই গোলাপ জড়িয়ে গেছে। হিন্দুস্থান যুগে যুগে তাঁকে বারবার আবিষ্কার করবে। ... আধুনিক হিন্দুস্থানে তিনি রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরুও দিশারী।'' ('হে মহান দিশারী'/'শাহজাদা দারা শুকো', প্রথম খণ্ড) তৎকালীন সময়ে ও বর্তমান সময়েও বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী (বিশেষত হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম) মানুষদের মধ্যে যে পারস্পরিক সংঘাত, অবিশ্বাস কাজ করে— এই প্রেক্ষাপটে 'শাহজাদা দারাশুকো উপন্যাসটিকে মিলন ভাবনার অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'আলো নেই' (দুটি খণ্ড) উপন্যাসেও লেখক পরাধীন ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিক কালখণ্ডকে কল্পনা ও শৈশব স্মৃতির মিশ্রণে তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সময়, সমাজ, রাজনীতি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক 'আলো নেই' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, ''অদূরেই স্বাধীনতা। দেশভাগ ঘনিয়ে এসেছে। কোথাও যেন আলো নেই। অখণ্ড বঙ্গে দমবন্ধ অবিশ্বাসের আবহাওয়া। শতাব্দীর পরে শতাব্দী যারা একে অন্যের পড়শী তাদের ভেতর রাজনীতির বিষ ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বাস, ভালবাসা ছিন্নভিন্ন।'' দানাবাঁধা ঘন বেদনার পর্বটি লেখক অত্যন্ত অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে এক বিশ্বাসযোগ্য রূপ দিয়েছেন। আমাদের গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বাংলার মানুষের সঙ্গে নদীর এক গভীর সখ্য রয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের একটি ধারা রয়েছে। তবে শুধু বাংলার মানুষের সঙ্গেই নয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে নদীর গভীর যোগ বর্তমান। কখনও পরম বন্ধু কখনও ধ্বংসকারী হিসাবে নদী মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য শুধু দেশে নয় বিদেশেও, শুধু আধুনিক সাহিত্যে নয় প্রাচীন সাহিত্যেও নদী গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসাবে উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব,

'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, মৈমনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি সাহিত্যে নদী বিভিন্ন রূপে উপস্থিত হয়েছে। বাংলা আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যে নদীর অনুষঙ্গ প্রথম আসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসে যেখানে গঙ্গা নদীর ভূমিকা দেখি। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে নদী কেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' (১৯৪০), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' (১৯৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৬৭), অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' (১৯৫৬), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮), হুমায়ুন কবীরের 'নদী ও নারী' (১৯৪৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' (১৯৫১), দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) ইত্যাদি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শৈশব কেটেছে ভৈরব-রূপসা নদীর সহচর্যে। শৈশব পরবর্তী জীবন গঙ্গা নদীর সহচর্যে। তাই নদী অনুষঙ্গ খুব সহজভাবেই শ্যামলের উপন্যাসে এসেছে। তবে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস হিসাবে আমরা লেখকের একটি উপন্যাস পাই। তা হলো 'গঙ্গা একটি নদীর নাম'। তবে লেখকের নদী অপেক্ষা অধিক আগ্রহের বিষয় ছিল নদী তীরবর্তী দু'পাশের মানুষের জীবনকথা। তাই লেখক এই উপন্যাসে কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অপেক্ষা ব্যক্তি জীবনের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। সেই ব্যক্তি জীবনের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। এখানেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। কলকাতা শহরের অন্যতম একটি অঙ্গ হলো গ্রুপ থিয়েটার। এই গ্রুপথিয়েটার ও থিয়েটার সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের নিয়ে লিখেছেন 'অদ্য শেষ রজনী'। বাংলা সাহিত্যে এর আগে এই বিষয় নিয়ে কোনও উপন্যাস রচিত হয়নি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষের আত্মহত্যা করার প্রবণতা ছোঁয়াচে রোগের রূপ নেবে। এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন 'নতুন ভুবন' উপন্যাসটি। মানুষের রাতারাতি বড়লোক হবার অন্তহীন লোভকে হাতিয়ার করে কীভাবে চিটফাণ্ড সাধারণ মানুষকে বোকা বানায়, সর্বশান্ত করে— এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন 'সওদাগর' উপন্যাস। বিষয়বৈচিত্র্যে শ্যামলের রচনাসম্ভার যে অনেক সমৃদ্ধ, তা আমরা আমাদের গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সংশয়তাড়িত মন নিয়ে লিখেছেন। আর এই সংশতাড়িত মন বারবার নিজের জীবন অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেছে। তাই কাহিনির বৃত্ত নির্মাণে লেখকের খুব বেশি

আগ্রহ ছিল না। লেখা তো শ্যামলের কাছে উদ্‌যাপনের বিষয়। তাই কিছুটা অগোছালো মনোভাব কাহিনির বৃত্ত নির্মাণে দেখা যায়। আত্মজৈবনিক উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহার যৌগিক প্লট সৃষ্টির অন্যতম কারণ। পাঠককে সম্বোধন করে কাহিনি উপস্থাপনা করেছেন বঙ্কিমীয় রীতিতে। যেমন, 'সতী অসতী' উপন্যাস। আবার বিভিন্ন শিরোনাম ব্যবহার করে কাহিনি উপস্থাপন রীতিও শ্যামলের উপন্যাসে দেখা যায়। যেমন, 'এক সিংহ ও তার রমণী' উপন্যাস। কল্পনার ন্যূনতম প্রয়োগ লেখকের কাহিনি নির্মাণ কৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় কল্পনার মিশ্রণ দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল লেখকের। শ্যামল নিজেই বলেছেন, ''কিন্তু নিপুণতার পরেও একটা কথা আছে। তা হল কল্পনা। দৈবী পাগলামো। ম্যাজিক রিয়ালিটি। যা না থাকলে পৌনঃ পুনিকতায় সবই জীর্ণ হয়ে বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য।" (জীবন রহস্য/পৃ. ২০৮) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লেখার ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে খুব বেশি ভাবিত ছিলেন না। কারণ তাঁর মতে, বিষয় শক্তিশালী হলে বিষয় অনুযায়ী ভাষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। ভাষা আসলে বিষয়ের 'দাসানুদাস'। বরং সেই সময়ে ভাষা নিয়ে হয়তো সবচেয়ে বেশি যে ভেবেছেন, সেই কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য হলো, ''কমলকুমারের বলার কথা কি ছিল? অন্তর্জলিযাত্রায় যা তিনি বলেছিলেন তা কি আরও সহজ করে বলা যেত না? ওই ভাষাই কি তাঁর সৌন্দর্যবোধ সবচেয়ে ভালো করে প্রকাশ করতে পারে? নান্দনিক বিকাশের পক্ষে ওই ভাষা কি বাধা নয়?" (জীবন রহস্য/পৃ. ২০৪) কাটা কাটা বাক্যে, আটপৌর শব্দে, সহজাত ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারে নিজস্বতা তৈরি করেছেন। তবে অনেক উপন্যাসে চিঠি-পত্র, ডায়ারি লেখার সময় শ্যামল সাধু ভাষার ব্যবহার করেছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পরীতি নিয়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

বয়সের পার্থক্যকে শ্যামল বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। অনেক কম বয়সের লেখকদের সঙ্গে শ্যামল খুব সহজ ভাবে মিশতেন। শুধু মিশতেন বললে ভুল হবে— তাঁর দ্বারা অনেক অনুজ লেখক প্রভাবিতও হয়েছেন। যেমন, কিন্নর রায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, নলিনী বেড়া, রবিশংকর বল, তুষার চৌধুরী, ভগীরথ মিশ্র প্রমুখ। মতি নন্দী লিখেছেন, ''রাস্তায় একে একে এসে পৌঁছেছে বাংলা সাহিত্যের তরুণ প্রজন্ম। তারা শ্যামলকে শ্রদ্ধাই শুধু নয়, একজন প্রধান লেখকের স্বীকৃতি জানাতেও এসেছে। দেখে ঈর্ষা হল। ওই তরুণদের আসাটাই বুঝিয়ে দিল শ্যামল কত বড় লেখক। মিডিয়ার ঢক্কা নিনাদ দ্বারা শ্যামল নির্মিত নয়।" (কত বড় বোঝাল তরুণরাই/ প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১২)

অনুজ সাহিত্যিকদের যেমন তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি অগ্রজ সাহিত্যিক দ্বারা তিনি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বন্ধু মহলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের প্রিয় লেখক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তেমনি নিজের গদ্যরচনাতেও বিভূতিভূষণের নাম প্রিয় লেখক হিসাবে লিখেছেন। আমাদেরও মনে হয় বিভূতিভূষণের প্রভাব শ্যামলের লেখায় ছিল। 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসটি দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা লেখকদ্বয়ের মধ্যে অন্যতম একটি সাদৃশ্যের বিষয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শিশুসাহিত্যিক হিসাবেও খ্যাতি পেয়েছিলেন। জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা, লিখেছেন অনেক ছোটগল্প। শিশুসাহিত্যিক হিসাবে, ছোটগল্পকার হিসাবে, সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসাবে শ্যামলের মূল্যায়ন পৃথক গবেষণার দাবি রাখে। আমাদের গবেষণা পত্রে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আলোচনা বিবৃতিমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও তুলনামূলকভাবে তুলে ধরেছি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনকে উপভোগ করার যে প্রবণতা ছিল, উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকের মধ্যেও তিনি তা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। তাই শ্যামলের উপন্যাসসম্ভার বাংলা সাহিত্যকে অনেক সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তেমন জীবনদৃষ্টির স্বতন্ত্রতা লেখককে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। শিল্পরীতির ক্ষেত্রেও নিজস্বতা সৃষ্টিতে সফলতা লাভ করেছেন লেখক। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলা সাহিত্যের গভীরতা, বৈচিত্র্য ও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সময়-সমাজ দেখানোর চেষ্টা করেছি। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আলোচনায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আলোচনা তাই অনিবার্য।